হুমায়ূন আহমেদ
রিভিউ সমগ্র ১

সংকলনেঃ এ্যাডমিন প্যানেল

বইপোকাদের আড্ডাখানা

হুমায়ূন আহমেদের

রিভিউ সমগ্র ১

কনসেপ্ট এণ্ড ডিজাইন

আর্য্য মিঠুন

সম্পাদনায়

মাসুম আহমেদ আদি

এবং

আশিক সরকার শুভ

সংকলনেঃ এ্যাডমিন প্যানেল

বইপোকাদের আড্ডাখানা

ভূমিকা

ফেসবুকে আমরা কিছু তরুণেরা মিলে একটা বইয়ের গ্রুপ চালাই। " বইপোকাদের আড্ডাখানা" যার নাম। আমাদের উদ্দেশ্য তরুনদের আবার বইমুখো করা। এজন্যে আমরা নানানরকম উদ্যোগ নিয়েছি। তার মধ্যে একটা হলো রিভিউ সংগ্রহ করা।

এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে, রিভিউ কি? কিভাবে রিভিউ লিখে? এবং এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তরগুলোও খুব সহজ। একটা বই পড়ার পর সেটার ভালো লাগা মন্দ লাগা এবং কেনো ভালো বা মন্দ লেগেছে সেটা দু চার কথায় গুছিয়ে লেখাই হচ্ছে রিভিউ।

রিভিউ লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন পাঠকেরা যেনো বইটা সম্মন্ধে জানতে পারে। তাহলে তাদের মধ্যে বইটি পড়ার উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

বাংলা সাহিত্যে এত পরিমান বই আছে যে সব বই কারও একার পক্ষে পড়ে শেষ করা সম্ভব নয়।

সেক্ষেত্রে কোন কোন বই তার পড়তে হবে, সেটার একটা ধারনা সে রিভিউ থেকে পাবে।

আমাদের এই সংকলনে হুমায়ূন আহমেদের ২০ টি রিভিউ আছে। রিভিউ লেখকদের নাম তাদের ফেসবুক আইডি নামে দেয়া হয়েছে।

এই রিভিউ সংকলন পড়ে যদি আপনার একটা বইও পড়তে ইচ্ছা হয় তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

মাসুম আহমেদ আদি,

এডমিন,বইপোকাদের আড্ডাখানা।

৯ই অক্টোবর ২০১৫।

বইয়ের নামসমূহ

১.কালো যাদুকর

২.বাদশাহ নামদার

৩.আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি

৪.দরজার ওপাশে

৫.পিপলী বেগম

৬.আজ চিত্রার বিয়ে

৭.বহুব্রীহি

৮.বৃহন্নলা

৯.চক্ষে আমার তৃষ্ণা

১০.কৃষ্ণপক্ষ

১১.সৌরভ

১২.মেঘ বলছে যাব যাব

১৩.নি

১৪.কিছুক্ষন

১৫.দেবী

১৬.নবনী

১৭.মধ্যহ্ন

১৮.অপেক্ষা

১৯.নীল অপরাজিতা

২০.রং পেন্সিল

১.কালো যাদুকর

প্রকাশকালঃ ২০০৫
প্রকাশকঃ পার্ল পাবলিশার্স
মূল্যঃ ১৫০ টাকা।

রিভিউ রাইটারঃ মাসুম আহমেদ আদি

পৌষ মাসের প্রচন্ড শীতের রাত।লোকজন বলাবলি করছে এবার বুড়োমারা শীত পরেছে। এরই মধ্যে গলায় মাফলার পেচিয়ে গায়ে শাল জড়িয়ে মবিন উদ্দিন সাহেব তার বোন রাহেলার বাড়ি যাচ্ছেন। মবিন উদ্দিনের বয়স পঞ্চাশ। নেত্রকোনা শহরে "বিউটি বুক সেন্টার" নামে তার একটা বইয়ের দোকান আছে। দোকানের বিক্রি-বাট্টা তেমন ভাল না।কোনও রকম সংসার চালাচ্ছেন এই দিয়ে। স্ত্রী এবং ১৩ বছরের এক অন্ধ মেয়ে নিয়ে তার সংসার।মেয়ের নাম সুপ্তি।সুপ্তি দেখতে অসাধারন সুন্দর। সব থেকে সুন্দর ওর চোখদুটি। কেউ ওর চোখদুটি দেখলে বিশ্বাস করতে চাইবেনা যে সে অন্ধ। আরও একজন মানুষ মবিন উদ্দিনের সংসারে ছিল। তার বড় ছেলে টুনু। বছর ছয়েক আগে প্রচন্ড জ্বর উঠে মারা গেল।ও তখন ভার্সিটির হোস্টেলে ছিল। জ্বর বেশি দেখে শিক্ষকরা মিলে ওকে হাসপাতাল নিয়ে যায়। মবিন সাহেব হাসপাতালে গিয়ে দেখেন ছেলে অজ্ঞান। নার্স এসে বলল ওর জ্ঞ্যান ফিরতে দেরি হবে, আপনি বরং এই ফাকে চা খেয়ে আসুন। তিনি চা খেয়ে ফিরে এসে আর ছেলেকে পেলেন না। শুনলেন মৃত্যুর আগে টুনুর জ্ঞ্যান ফিরেছিল। সে জিজ্ঞেস করেছিল "বাবা আসেনি?" এর জন্য তিনি গত ছয় বছর ধরে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সেদিন চা খেতে না গেলে ছেলেকে শেষ দেখা দেখতে পেতেন।

বর্তমানে ফেরা যাক। রাহেলার বাড়ি যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন এক জায়গায় অনেকটা জটলা। এই শীতের রাতে এইরকম জটলা হওয়ার কথা না। তিনি একটু এগিয়ে দেখলেন একটা ছেলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। এই প্রচন্ড শীতেও ছেলেটা শুধুমাত্র একটা পাতলা হাফ হাতা শার্ট পড়ে আছে। দেখে তার মায়া লাগল। ম্যাজিক দেখানোর পর ছেলেটা হয়তো সবার কাছে হাত পাতবে।বেশিরভাগ মানুষই কিছু না দিয়েই চলে যাবে।তিনি একবার ভাবলেন পকেটের দুটা পাঁচ টাকার নোটের একটা দিয়ে দিই। আবার ভাবলেন তার মত দরিদ্রর কাছে পাঁচ টাকা অনেক টাকা।

রাহেলার বাড়ি থেকে ফেরার সময় ষ্টেশন এর টিকিট কাটার সিড়িঘরে দেখলেন ঐ ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা বসে আছে।তিনি ভাবলেন ছেলেটাকে বাড়ি নিয়ে একবেলা ভাত খাওয়ানো যাক। ছেলেটাকে নিয়ে তিনি রিকশায় উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি?
ছেলেটা উত্তর দিল "টুনু"।

মবিন সাহেব ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেন। টুনু তার মৃত ছেলের নাম। এবং তিনি আরেকটা বেপার খেয়াল করে চমকে উঠলেন।ছেলেটার চেহারা অবিকল তার ছেলে টুনুর মত। সেদিন সেই ছেলেটাকে বাড়ি নিয়ে না গেলে তার জীবনটা অন্যরকম হতে পারত।

ছেলেটাকে পেয়ে তার মেয়ে সুপ্তি অসম্ভব আনন্দিত। তার স্ত্রী প্রথমদিন গাইগুই করলেও পরে তিনিও ছেলেটাকে পছন্দ করতে লাগলেন। তার মৃত ছেলে টুনুর সাথে তার চেহারার মিল আছে দেখেই হয়তোবা।

ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা বাড়ি আসার পর আজব আজব ঘটনা ঘটতে লাগল। মবিন সাহেব চা খাওয়া ধরলেন। বাড়িতে কখনও ভাঁপা পিঠা হতোনা, কারন মবিন উদ্দিনের মৃত ছেলে টুনুর খুব পছন্দের ছিল ভাঁপা পিঠা। ভাঁপা পিঠা বানানো হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার জন্য।ছয় বছর ধরে টুনুর ঘরটা বন্ধ ছিল, বাকি জীবন বন্ধই থাকবে সেরকম কথা ছিল। সেই ঘরটা ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার জন্য খুলে দেয়া হলো।

মবিন সাহেব খেয়াল করেছিলেন যে ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা মনের কথা বুঝতে পারে।একবার দুপুরে খাওয়ার পর লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে তার মনে হল জর্দা দিয়ে একটা পান খেলে ভালো লাগত। কিন্তু আলস্যের কারনে উঠতে মন চাচ্ছিল না। তখন সুপ্তি এসে বলল–
-বাবা এই নাও তোমার জর্দা দিয়ে পান। ম্যাজিশিয়ান ভাইয়া পাঠিয়েছে।

ভয়ের বেপারটা হলো কিছুদিন যাবত তিনি নিজেও মানুষের মনের কথা বুঝতে পারছেন।

সুপ্তিকে তিনি ম্যাজিশিয়ান ছেলেটাকে গাছ ভাইয়া ডাকতে শুনেছেন। সুপ্তিকে জিজ্ঞেস করে জেনেছেন ছেলেটা নাকি নিজেকে গাছ বলে। তিনি নিজেও স্বপ্নে একবার এই বেপারটা দেকেছেন।
ছেলেটা নিজেকে কেনো গাছ বলে এইটা একটা রহস্য।

ছেলেটা চলে যাওয়ার আগে একটা চিঠি লিখে মবিন উদ্দিনের হাতে দিয়ে যায়। সেখানে সব রহস্যের সমাধান থাকে। যাওয়ার আগে ছেলেটা সুপ্তিকে একটা উপহার দিয়ে যায়। সুপ্তির এই ক্ষুদ্র জীবনের সব থেকে সেরা উপহার।

ব্যাক্তিগত মতামতঃ

অনেকদিন পর এক নিশ্বাসে কোনও বই শেষ করলাম। সুপ্তি মেয়েটাকে খুব ভাল লেগেছে। মেয়েটা অন্ধ হলেও অসম্ভব বুদ্ধিমতি। ম্যাজিশিয়ান ছেলের চরিত্রটা অদ্ভুত কিন্তু ভালো লাগার একটা বেপার ওর মধ্যে আছে। প্রথম দুই পাতা পড়ার পর আপনি পুরুটা এক নিশ্বাসে শেষ না করে পারবেন না।

২.বাদশাহ নামদার

রিভিউ রাইটারঃ রাস্তার ফকির

বইয়ের নামের মধ্যেই যেমন সরলতার একটা ভাব আছে, পুরো বইটা জুড়েও তেমনটাই পাওয়া যাবে। লেখক আর কেউ নন, আমাদের হুমায়ূন আহমেদ। বইয়ের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে মোঘল সম্রাট নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ূন মীর্জা- কে নিয়ে, যিনি পিতার দিক থেকে তৈমুরের পঞ্চম অধস্তন এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানের পঞ্চদশ পুরুষ।

বাদশাহ নামদার,
স্বভাবতই ইতিহাসভিত্তিক বই, কিন্তু পাঠক হিসেবে বলতে পারি, পড়তে পড়তে এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি, গৎবাঁধা চিরাচরিত কোন ইতিহাসের বই পড়ছি। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, সম্রাট হুমায়ূন চরিত্রটি লেখক হুমায়ূনের অন্যান্য চরিত্রের সাথে এতোই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, পাঠক হিসেবে ভুলেই যেতে হয়, এ কোন সম্রাটের জীবনী, যিনি কিনা খেয়ালের বশে রাজকোষের সব অর্থ নিয়ে পালিয়ে যান বাদাখশানে, যিনি কিনা সাম্রাজ্য হারিয়েও চৌদ্দ বছরের হামিদা বানুর প্রেমে পড়েন,এবং বিবাহে রাজি করাবার জন্য উপবাসও থাকেন!! এই হামিদা বানুর গর্ভেই জন্ম নেন আকবর দ্যা গ্রেট।

সম্রাট হুমায়ূন চরিত্র যে কত বিচিত্র, তার জীবনে যে কত রঙ চড়ানো, তা এতদিন শুনেই এসেছিলাম, আজ তা লেখক হুমায়ূনের গুণে পড়া হল। সম্রাট হুমায়ূন শুধু তার খেয়ালিপনার জন্যই বিখ্যাত ছিলেন না, মোঘল চিত্রকলার শুরু হয়েছিল তারই হাত ধরে, ছিলেন কবি, তার চিরশত্রু শের শাহ , যিনি-ই হুমায়ূনকে পরাজিত করে আগ্রা দখল করেছিলেন, তাঁরও নির্দেশ ছিল, "সম্রাট হুমায়ূনকে কোন অবস্থাতেই হত্যা করা যাবে না" কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, " তিনি মহান মানুষদের একজন। এই মানুষটির অন্তর স্বর্ণখণ্ডের মতো উজ্জ্বল। সেখানে কলুষতার কণামাত্র নাই।"

সম্রাট হুমায়ূনের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা ছিল মানুষকে ভালবাসবার ক্ষমতা। "জাদুকরী ক্ষমতার হুমায়ূনের মতো মানুষরা যা কিছু হারায় সবই ফিরে পায়। মানুষের ভালোবাসার কারণে ফিরে পায়। " আসলেই সম্রাট ফিরে পেয়েছিলেন তার হারানো সাম্রাজ্য, বজায় রেখেছিলেন মোঘল ঐতিহ্যও।

হাজারো উত্থান- পতন, দেনা- পাওনা, হারানো- ফিরে পাওয়ার মাঝেও , হুমায়ূনের ছোট মেয়ে আকিকা বেগমের কথা ঘুরেফিরে এসেছে। তার প্রতি সম্রাটের প্রগাঢ় ভালোবাসার নিদর্শন এটি। সেনাপতি বৈরাম খাঁ বিশেষ চরিত্র, যার বীরত্ব আর সাহসিকতা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, সম্রাট হুমায়ূনের প্রতি তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা চোখে পড়বার মতো।

এছাড়া আমরা পাবো বিশ্বাসঘাতক হরিসঙ্করকে, সিংহাসনলোভী হুমায়ূনের ভাই কামরান মীর্জাকে, হুমায়ূনের আরেক অনুগত আবতাবচি (যিনি পানি সরবরাহ করেন) জওহরকে। শেষ জীবনে হুমায়ূন সব কিছুই বৈরাম খাঁ এর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, যিনি পরবর্তীতে সম্রাটের মৃত্যুর পর আকবরের অভিভাবক হয়েছিলেন। তার করুণ মৃত্যুর কথা নাই বা বললাম, কিছুটা ট্র্যাজেডি পড়বার জন্যই না হয় রেখে দিলাম!!

সবশেষে একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, যা পাঠক হিসেবেই কৌতূহল, তা হল, বইটা পড়বার এক পর্যায়ে মনে হল, ঘটনাগুলো কি আসলেই এতো বেমানান?? নাকি লেখক হুমায়ূন তার কিংবা তার চরিত্রের জীবনের সাথে সম্রাট হুমায়ূনের মিল পেয়েছেন বিধায় এমন লেখায় আগ্রহী হলেন?? অথবা

হাজারো ঘটনা থেকে সেগুলোই তুলে নিলেন যা তিনি চেয়েছেন?? আর সে জন্যই ভূমিকাতে এই লেখার পিছনের কোন কারণ শক্তভাবে উল্লেখ করেননি।

লেখক, বইটি উৎসর্গও করেছেন তার ছোট ছেলে নিনিত হুমায়ূনকে, যেখানে বলেছেন– " আমার কেবলই মনে হচ্ছে পুত্র নিনিত পিতার কোন স্মৃতি না নিয়েই বড় হবে।...... এই বইয়ের উৎসর্গপত্রও স্মৃতি মনে রাখা প্রকল্পের অংশ।" বইটি শেষও হয়েছে সম্রাটের ছোট পুত্র আকবরকে দিয়ে, যে ১৪ বছর বয়সেই দিল্লীর মসনদে বসেছিল!!

এটা হয়তো কাকতলীয় , কে বা জানে?? শেষ করছি হিন্দুস্থানের অধীশ্বর দিল্লীর সম্রাট শের শাহকে পাঠানো রাজ্যহারা হুমায়ূনের একটি শের দিয়ে–

"যদিও দর্পণে আপন চেহারা দেখা যায়
কিন্তু তা পৃথক থাকে
নিজে নিজেকে অন্যরূপে দেখা
আশ্চর্যের ব্যাপার।
এ হলো আল্লাহর অলৌকিক কাজ"

৩.আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি

প্রকাশকঃ অন্য প্রকাশ।
প্রকাশকালঃ বইমেলা ২০০৩
মূল্যঃ ১৮০ টাকা মাত্র

রিভিউ রাইটারঃ মাসুম আহমেদ আদি

প্রথমেই বলে রাখি এটি একটি সাইকো থ্রিলার। গল্পের প্রধান চরিত্র ফখরুদ্দিন চৌধুরী। বইটি উত্তমপুরুষে লেখা। ফখরুদ্দিনের নিজের জবানিতে কাহিনী বর্ণনা করা।পড়ার সময় মনে হয় সে আপনাকেই গল্পটা বলছে।

ফখরুদ্দিন সাহেবের বিয়ে নিয়ে একটা ঘটনা আছে। সে তার দূরসম্পর্কের মামার সাথে কনে দেখতে যায়। কনে পছন্দ হওয়াতে সেরাতেই তারা বিয়ের কাজ সমাধা করে রাখে। উল্লেখ্য যে ফখরুদ্দিনের মামা ইফতেখার সাহেব একজন সরকারী কাজি । বিয়ের পরদিন তার স্ত্রী তার সাথে থাকতে রাজি হন না।বিয়ে ভেঙ্গে দিতে সে কান্নাকাটি শুরু করে। এই ঘটনায় ফখরুদ্দিন বিয়ে ভেঙ্গে দেয়।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর তার সাবেক স্ত্রীর ছোট বোনের সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার বিয়ে হয়।তার স্ত্রী রুপা বিয়ের কদিনের মাথায় মনে করে তার স্বামী মানসিক রুগী। সে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে একজন সাইক্রিয়াটিস্ট এর কাছেও নিয়ে যায়।

অবশ্য রুপার ওকে মানসিকভাবে অসুস্থ ভাবার অনেক কারন আছে।
তারমধ্যে থেকে দুইটা ঘটনা বলি।

১. ফখরুদ্দিন সাহেবের একটা বদভ্যাশ হচ্ছে রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে ছাদে শুয়ে থাকা। একদিন বৃষ্টির সময় রুপার ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে ছাদে গিয়ে দেখে ফখরুদ্দিন বৃষ্টির মধ্যেই শুয়ে আছে। ছাদে পানি জমে গেছে, সে তার মধ্যেই শুয়ে আছে।

২. ফখরুদ্দিন একবার এক্সপেরিমেন্টের জন্য ১০ ব্যাগ রক্ত নিয়ে আসে। সে রক্ত সে পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে দিয়ে দেখতে চাচ্ছে ফলাফল কি হয়।

এই দুইটা ঘটনাই ফখরুদ্দিন কে মানসিক রুগী ভাবতে যথেষ্ট।আরও নানান ঘটনা আছে।

ফখরুদ্দিন দুইটা খুন করে ঠান্ডা মাথায়। অবশ্য সে ফিজিক্যালি খুন টা করেনা। সাইকোলজিক্যাল ভাবে খুন করে। অবশ্য এগুলাও তার এক্সপেরিমেন্টের অংশ।

ব্যক্তিগত মতামতঃ

বিদেশে এরকম একটা সাইকো থ্রিলার বেরুলে হইচই পড়ে যেত। অথচ এই বই নিয়ে আমি কোনও হইচই দেখিনি। আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লেগেছে। যারা সাইকো থ্রিলার পছন্দ করেন তাদের ভালো লাগবে আশা করি।

৪.দরজার ওপাশে

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯২
প্রকাশনীঃ জ্ঞানকোষ
প্রচ্ছদঃ ধ্রুব এষ

রিভিউ রাইটারঃ রঞ্জনা বসু

ফ্ল্যাপে লিখা কথাঃ
তার ডাক নাম হিমু। ভালো নাম হিমালয়। বাবা আগ্রহ করে হিলাময় নাম রেখেছিলেন যেন বড় হয়ে সে হিমালয়ের মতো হয়- বিশাল ও বিস্তৃত, কিন্তু ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। ইচ্ছে করলে তিনি ছেলের নাম সমুদ্র রাখতে পারতেন। সমুদ্র বিশাল এবং বিস্তৃত। সমুদ্রকে হাত দিয় স্পর্শ করা যায়। তার চেয়েও বড় কথা, সমুদ্র আকাশের ছায়া পড়ে। কিন্তু তিনি সমুদ্র নাম না রেখে রাখলেন হিমালয়। কঠিন মৌ পবর্তমালা, যার গায়ে আকাশের ছায়া পড়ে না ঠিকই কিন্তু সে নিজেই আকাশ স্পর্শ করতে চায়। হিমুর বাবার চেয়েছিলেন হিমু একজন মহাপুরুষ হবে, যে মহাপুরুষ পরম সত্য জানেন। কিন্তু হিমু কি চেয়েছিল? আমরা তার বাবার আকাঙ্ক্ষার কথা জানি, হিমুর আকাঙ্ক্ষা জানি না। সে কিসের সন্ধান করে বা আসলেই সে কোন কিছুর সন্ধান করে কি-না তা নিয়েই লেখা 'দরজার ওপাশে'।

প্রস্তাবনাঃ
তার ডাক নাম হিমু। ভালো নাম হিমালয়। বাবা আগ্রহ করে হিমালয় নাম রেখেছিলেন যেন বড় হয়ে সে হিমালয়ের মতো হয়- বিশাল ও বিস্তৃত, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। ইচ্ছে করলে তিনি ছেলের নাম সমুদ্র রাখতে পারতেন। সমুদ্রও বিশাল এবং বিস্তৃত। সমুদ্রকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। তার চেয়েও বড় কথা, সমুদ্রে আকাশের ছায়া পড়ে। কিন্তু তিনি সমুদ্র নাম না রেখে রাখলেন হিমালয়। কঠিন মৌন পবর্তমালা, যার গায়ে আকাশের ছায়া পড়ে না ঠিকই কিন্তু সে নিজেই আকাশ স্পর্শ করতে চায়। হিমুর বাবা চেয়েছিলেন হিমু একজন মহাপুরুষ হবে, যে মহাপুরুষ পরম সত্য জানেন। কিন্তু হিমু কি চেয়েছিল? আমরা তার বাবার আকাঙ্ক্ষার কথা জানি, হিমুর আকাঙ্ক্ষা জানি না। সে কিসের সন্ধান করে বা আসলেই সে কোন কিছুর সন্ধান করে কি-না তা নিয়েই লেখা হলো 'দরজার ওপাশে'। যদিও আমি খুব গুরুত্বের সঙ্গে লেখাটি লিকেছি তবু বিনীত অনুরোধ করছি কেউ যেন গুরুত্বের সঙ্গে লেখাটি গ্রহণ না করেন। মিসির আলী নামে আমার একটি চরিত্র আছে। সে কাজ করে লজিক নিয়ে। তার চিন্তা-ভাবনা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা যায় কিন্তু হিমু কাজ করে 'এন্টি-লজিক' নিয়ে। আমাদের এই জগতে 'এন্টি লজিকে'র স্থান নেই।

হুমায়ূন আহমেদ
৫ই মে ১৯৯২

পাঠ প্রতিক্রিয়াঃ
চিরচেনা হিমুকে নতুন আঙ্গিকে দেখার প্রয়াস।

হিমুর পুরো নাম হিমালয়। এ নাম তার বাবার রাখা। হিমুর বাবা হিমালয় নাম রেখেছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলে হিমালয়ের মত বিশাল ও বিস্তৃত হোক, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কেউ নয়, তাকে যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। যেমন স্পর্শ করা যায় হিমালয় পর্বতকে। হিমুর বাবার স্বপ্ন ছিল তিনি হিমুকে মহাপুরুষ বানাবেন। কিন্তু হিমুর আসলে কি স্বপ্ন ছিল? সে কি আসলেই মহাপুরুষ হতে চেয়েছিল? আমরা হিমুর বাবার আকাঙ্ক্ষার কথা জানি, কিন্তু হিমুর আকাঙ্ক্ষার কথা জানি না। হুমায়ূন আহমেদ দরজার ওপাশে বইয়ে হিমুর আকাঙ্ক্ষার স্বরুপ খোঁজার প্রয়াস পেয়েছেন।

বইয়ের গল্প শুরু হয় হিমুর মেস থেকে। তারপর নদীর পানির মত কাহিনী গড়াতে থাকে। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর অস্বাভাবিক সম্মোহনী ক্ষমতার দ্বারা মুহূর্তের মধ্যেই পাঠককে গল্পের ভিতরে টেনে নিয়ে যান। গল্পের ভিতরে ধীরে ধীরে হিমুর বন্ধু রফিক, জহির, রফিকের স্ত্রী রানু, জহিরের বোন তিতলী, জহিরের বাবা তেল ও জ্বালানী মন্ত্রী মোবারক হোসেনের আগমন ঘটে। আর হিমুর অন্যান্য বইয়ের মতই অবধারিতভাবেই ঘটনাচক্রে এসে যুক্ত হয় হিমুর ফুফা, ফুফাতো ভাই বাদল আর একজন পুলিশের ওসি। কখনও হাস্যরসে, কখনও সংলাপের শক্ত গাঁথুনি দিয়ে, কখনও বা খুব স্বাভাবিক কথার ভিতরেও দর্শন মিশিয়ে দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ নিরন্তর পাঠককে টানতে থাকেন।

এই বইয়ের অসাধারণ অলংকার হল কিছু জোছনা রাতের অতিপ্রাকৃত পরিবেশের সম্মোহনী বর্ণনা যা পাঠককে সহজেই বিভ্রমের বেড়াজালে আক্রান্ত করে ফেলে। আর হিমুর সর্বজনীন সত্যের পিছনে ছুটে চলার কাহিনী পুরো বই জুড়েই বিস্তৃত হয়েছে, যা হিমু ভক্তদের অবশ্যই আনন্দ দিবে।

সব মিলিয়ে হুমায়ূন আহমেদ স্যারের দরজার ওপাশে দারুণ একটি বই। একবার শুরু করলে শেষ না করে উঠা যায় না, এমন একটি বই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বইটি সকল হুমায়ূন ভক্তদের অবশ্যপাঠ্য।

৫.পিপলী বেগম

প্রকাশকালঃ ১৯৯৩
প্রকাশকঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা।
মূল্যঃ বর্তমান মূল্য জানা নেই।

রিভিউ রাইটারঃ মাসুম আহমেদ আদি

পিপলী বেগম মূলত ছোটদের বই। তবে যেসব বাবা মা বই পড়ে বাচ্চাদের গল্প শোনাতে চান বইটি তারাও পড়তে পারেন।

মতিন সাহেবের তিন মেয়ে। তিলু সবার বড়, সে ভিকারুন্নেসায় ক্লাস সেভেনে পড়ে। তার ছোটটা বিলু, সে একই স্কুলে থ্রি তে পড়ে। সবার ছোটটা এখনও কোথাও ভর্তি হয়নি।

মতিন সাহেব ডাক্তার মানুষ। বাচ্চাদের সময় দিতে পারেন না।খুব ভোরবেলা বেড়িয়ে যান এবং অনেক রাতে ফেরেন। বাচ্চাদের সাথে দেখাই হয়না। ওরা যখন তাকে ভুলতে বসেছে তখন তিনি দুদিনের ছুটি নিলেন।

দ্বিতীয় দিন প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। উনার স্ত্রী বাসায় নেই, ভাইয়ের বাসায় গিয়ে আটকে গেছেন,রাতে ফিরবেন না। তিন নেয়ে উনাকে ধরল গল্প শোনানোর জন্য। বাঘের গল্প। মুশকিল হল বাঘের কোনও গল্প উনার এই মুহূর্তে মনে পড়ছেনা। তিনি পিঁপড়ার গল্প শুরু করলেন। গল্পের নাম পিপলী বেগম।

পিপলী বেগম স্কুলে পড়ে। মানুষের মত তাদেরও স্কুল কলেজ আছে। হাসপাতাল আছে। বাড়িঘর আছে। একরুমের একটা ফ্ল্যাটে পিপলীরা থাকে। পিপলীর বাবা খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে কালো পিপরাদের হাতে বন্দি। পিপলী রাতে তার দাদির সাথে ঘুমায়। তার দাদির কথার অত্যাচারে সে অতিষ্ঠ। মাঝরাতে তিনি পিপলীকে ডেকে তুলে গল্প শোনান, ছড়া শোনান। ছড়াটা এরকম

যা বৃষ্টি যা,
যেখান থেকে এসেছিলি
সেইখানেতে যা।
সেইখানে তোর মা আছে
মায়ের কোলের আদর আছে।
যা বৃষ্টি যা,
মায়ের কোলে বসে বসে
মায়ের আদর খা।

পিঁপড়া সমাজের আরও অনেক অনেক গল্প আছে। অনেক কাহিনী আছে। সুখ দুঃখের গল্প,হাসি কান্নার গল্প।

ব্যক্তিগত মতামতঃ

ছোটদের উপহার দেয়ার জন্য আদর্শ বই। পিপলী বেগম কে ভালই লেগেছে, তবে গল্পটা আমার কাছে অতটা ভালো লাগেনি। কিজানি, হয়তো বড় হয়ে গেছি বলেই ভালো লাগেনি।

৬.আজ চিত্রার বিয়ে

রিভিউ রাইটারঃ মেহেদী হাসান

শেষ করলাম হুমায়ূন আহমেদের “আজ চিত্রার বিয়ে” উপন্যাসটি। সরল, সাধারণ আর দারিদ্র্যের সাথে পাল্লা দিয়ে উপরে উঠতে যেয়ে বিষণ্ণতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠা এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী চিত্রিত করেছেন লেখক তার এই বইয়ে নিজস্ব হুমায়ূনী ঢঙে।

যে মধ্যবিত্ত পরিবারে রয়েছেন একজন নিঃসঙ্গ পিতা যে কি না বড় বেশি ভীতু, বড় বেশি সামান্যতে তুষ্ট আর ছায়াসর্বস্ব মানুষ। জীবনের এক ক্লান্ত লগ্নে এসে কিছু কিছু মানুষ ছায়াময় হয়ে পড়েন তখন তাঁদের চলাফেরা হয়ে যায় ছায়ার মতন, কথা বলেন আপন আপন ছায়ার সাথে। ছায়ার যেমন প্রয়োজনীয়তা নেই কারো কাছে, তেমনি সংসার জীবনেও এইসব ছায়ামানবরা হয়ে পড়েন অকিঞ্চিৎকর, বড় বেশি তুচ্ছ, নগণ্য। এই পরিবারে রয়েছেন একজন কর্মঠ, পরিশ্রমী মা যে কিনা তার সন্তানের জন্যে সকল কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত অথচ স্বামীর বোনের ব্যাপারে নির্দয় আর পাষণ্ড হতেও বিবেকে বাধে না সামান্যতম। রয়েছে এক ছটফটে চঞ্চল সদা অভিমানী কিশোরী ছোটবোন আর রয়েছে চিত্রা, শ্যামলা সরল মুখের অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এক মেয়ে, যার আজ বিয়ে।

গল্পের শুরু এমন এক জায়গা থেকে যেখানে আমরা দেখতে পাই যে চিত্রার মা-শায়লা বানু, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন একটি ফোনের আশায়। যে ফোনটি আসবে বর পক্ষের কাছ থেকে। তাঁদের হ্যা অথবা না-য়ের মাঝে এই মুহূর্তে লুকিয়ে আছে সকল আনন্দ বেদনা এই পরিবারের। অনিশ্চয়তার এক সর্বগ্রাসি দোলায় বর্তমানে দুলছেন তিনি যেমন দুলে থাকেন বাংলাদেশের প্রতিটা বিবাহযোগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবার। তখন জানা গেল এঙ্গেজমেন্টের দিনই নাকি বরপক্ষ চাচ্ছে বিয়ে করে নিয়ে যেতে চিত্রাকে। এদিকে সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগছে মা-শায়লার কাছে। ছোট মেয়েটা যেন কার সাথে দিন রাত কথা বলে টেলিফোনে, সে কি পাশের বাড়ির ওই বেকার হাড় হাভাতে ছেলেটার সাথে? ননদের স্বামীর মতিগতি ভালো ঠেকছে না তার কাছে; না জানি কি কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে বসে এই বিয়ের দিনে! আর স্বামীর ভাব লক্ষণও খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছ না, দিনরাত কি যেন ভাবে সে? কিসের এতো ভাবনা তার? এরই মধ্যে শোনা গেল চিত্রার নাকি পছন্দের কোন এক ছেলে আছে, কে সেই ছেলে? আর চিত্রাই বা কোথায় গেল বিয়ের দিন? আর বলে গেল এগারোটার দিকে চলে আসবে বলে অথচ দুইটা বেজে গেল তবু কেন আসছে না? শঙ্কায় কাঁপে মায়ের মন, তবে কি শেষমেশ তাইই করল চিত্রা?

পুরো উপন্যাসটি লেখক উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোর পারস্পেক্টিভে বর্ননা করেছেন আর এভাবেই কাহিনী এগিয়ে গিয়ে পরিণতিতে পৌঁছেছে, কিন্তু লেখক একবারের জন্যেও চিত্রার পারস্পেক্টিভে কিছু বলেন নি, এতে করে কি লেখক কোন কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছেন? যেমন বাংলাদেশের সেটল ম্যারেজে পাত্রীর কিছু বলার সুযোগ থাকে না এখানেও কি তেমনি করেছেন লেখক চিত্রাকে কিছু না বলতে দিয়ে?

আমার এক প্রিয়ব্যক্তি একদা বলেছিল তার নাকি হুমায়ূন পড়তে ভালো লাগে না। কারণ জিজ্ঞাস করতে সে বলেছিল, হুমায়ুনের চরিত্রগুলো কেমন জানি একই রকম। মনে হয় এক ছাঁচ থেকে চরিত্রগুলোকে তিনি সৃষ্টি করেন, তার চরিত্রগুলোর মাঝে কোন বৈচিত্র্য নেই। সেই একই রূপবতী–গুণবতী–মায়াবতী–বুদ্ধিমতী মেয়ে আর সেই একই বেকার–রূপবান–অসুখে ভোগা ছেলে। আর যেন কোন কিছু নেই এই জগতে। সুতরাং, "আজ চিত্রার বিয়ে" বইতেও এই চরিত্রগুলোকেই আমরা দেখতে পাই ভিন্ন ভিন্ন নামে।

দুই ঘন্টার উপন্যাস হিসেবে চালিয়ে নেয়া যাবে কোন কথা না বাড়িয়েই। কে যেন একবার বলেছিল জনপ্রিয়তার বয়স ৫০ বছর। আমি আশা করি হুমায়ূন আহমেদ এই ৫০ বছর খুব তাড়াতাড়িই উৎরে যাবেন। কিন্তু পরবর্তী ৫০ বছর?

৭.বহুব্রীহি

প্রকাশকাল, প্রকাশক ও মূল্যঃ জানা নেই ("দশজন" নামে হুমায়ূন আহমেদের একটা সংকলন আছে, আমি সেখানে পড়েছি)

রিভিউ রাইটারঃ মাসুম আহমেদ আদি

বাড়ির নাম নিরিবিলি। বাড়ির কর্তা সোবাহান সাহেব দুবছর হলো উকালতি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন। তার দুই মেয়ে। বড় মেয়ে বিলু বরিশাল মেডিকেল কলেজে পড়ে। ছোট মেয়ে মিলি ইকনমিক্সে অনার্স করছে।সোবাহান সাহেবের স্ত্রি মিনু সাধারন গৃহবধূ। এবাড়িতে দুজন কাজের লোক রহিমার মা ও কাদের ছাড়াও আরেকজন থাকেন। তিনি মিলির মামা। তার কোনও কাজকর্ম নাই। সারাদিন শুয়ে বসে সিনেমা দেখে জীবন কাটানোই তার ইচ্ছা। তার আরেকটা ইচ্ছা হলো সিনেমা বানানো।

আনিসের মা মরা দুই ছেলে-মেয়ে টগর ও নিশা। এদের যন্ত্রনায় আনিস অতিষ্ট। ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিস খেলার নাম করে এরা ঘরের বিছানা এবং জানালার পর্দায় আগুন লাগিয়ে দেয়, পরে আগুন নেভাবে বলে। দর্জি দর্জি খেলার নাম করে এরা বিছানা কাঁথা বালিশ কাচি দিয়ে কেটে ফেলে। আনিসের বাড়িওয়ালা আনিস কে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছেন। আনিস ঘটনাক্রমে সোবাহান সাহেবের ছাদের দুইটা রুম ভাড়া নেয়।

মনসুর ডাক্তারি পাশ করে গ্রিন ফার্মেসি নামে একটা ফার্মেসিতে বসে। ফার্মেসির উপরতলায় ফার্মেসির মালিক তার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সোবাহান সাহেবের ছোট মেয়ে মিলি একদিন ঘটনাক্রমে তার ফার্মেসিতে আসে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনসুরও নিরিবিলিতে যাতায়াত শুরু করে।

হঠাৎ একদিন সোবাহান সাহেবের গ্রামের বাড়ি থেকে খোন্দকার এমদাদ সাহেব তার নাতনী পুতুল কে নিয়ে এই বাড়িতে উপস্থিৎ হয়। এমদাদ সাহেব খুবই ধড়িবাজ লোক। তার ইচ্ছা তার নাতনিকে মনসুর ডাক্তারের কাছে গছানোর।

"নিরিবিলি" নামক এই বাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটতে থাকে নানানরকম মজার মজার ঘটনা।

ব্যক্তিগত মতামতঃ

আমি কিভাবে এই বইটা এতোদিন মিস করে গেছি সেটা চিন্তা করলেই খারাপ লাগছে। অসাধারন একটা বই। হুমায়ূন আহমেদের অনেক বই পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু এই বইয়ের প্রতিটা

লাইন মজার। ভালো লাগার। মন খারাপের কোনও বিষয় এখানে নেই। মিলি, বিলু দুই বোনেরই অসাধারন বুদ্ধিমত্তা। দুবোনকেই ভালো লেগেছে। আনিসের জন্য প্রথমে মন খারাপ ছিল, সেটাও পরেরদিকে ভালো লাগাতে বদলে যায়। টগর ও নিশার দুষ্টুমিগুলাও ভালো লেগেছে। বইপোকাদের কথা দিচ্ছি ঠকবেন না বইটি পড়লে।

সতর্কতাঃ

যারা "মার্ডার ইন দ্যা ডার্ক" বইটা পড়ার লিস্টে রেখেছেন তারা সেটা শেষ না করে "বহুব্রীহি" পড়বেন না। কারন এই বইয়ে মার্ডার ইন দ্যা ডার্কের স্পয়লার দেয়া আছে।

পছন্দের উক্তিঃ তুই রাজাকার।

৮.বৃহন্নলা(মিসির আলি সিরিজ)

রিভিউ রাইটারঃ তোফায়েল

ঢাকা থেকে নব্বই মাইল দূরের এক মফস্বল শহরে বাস করেন সুধাকান্তবাবু নামের এক লোক। সবাই তাকে ডাকেন সাধু বলে। ছোটবেলা থেকেই গোরস্থান, শশ্মান ইত্যাদি জায়গার প্রতি প্রবল আকর্ষন তার। তার সম্পর্কে এক গল্প প্রচারিত আছে তার গ্রামে। গ্রামের সবাই বিশ্বাসও করে এই গল্প। গল্পটি অনেক বছর আগের। তখন সুধাকান্তবাবু স্কুলে শিক্ষকতা করেন। থাকতেন গ্রামের একেবারে বাইরের দিকের একটা জায়গায়। বাড়িতে থাকতেনও একা। গল্পটি তার মুখে এরকমঃ স্কুল শেষ করে প্রতিদিনই অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতাম আমি। ঐদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারদিকে ফকফকা জোছনা। কিন্তু কোনকিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। রাত এগারটার মত বাজে। গ্রামে রাত এগারটা মানে নিশি রাত। তার উপর শীতের রাত। রাস্তায় একা একা হাটতে হাটতে হঠাৎ একটা ভয় ঢুকে গেল আমার মনে। ভয়টা কেন আসল বলতে পারব না। ছোটবেলা থেকেই আমি একা থাকতাম। ভয় কাকে বলে জানতাম না। তার উপর শশ্মান কবরস্থান ইত্যাদির প্রতি আমার আকর্ষন ছিল অন্যরকম। কিন্তু কয়েকদিন থেকে শুনছি গ্রামে নাকি পাগলা কুকুর বের হয়েছে। ভয়টা হয়ত সেখান থেকেই এসেছে। আমি একটা লাঠি হাতে নিলাম যাতে সহজে কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত না হই। মনের মধ্যে একটা অজানা ভয় নিয়ে হাটছি আমি। মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তে কুকুরটাকে দেখতে পাব।

একটু পরই কুকুরটাকে দেখলাম একটা গাছের নিচে বসে আছে জিবটা বের করে। মুহূর্তের মধ্যে ভয়টা লাফ দিয়ে বেড়ে গেল। কুকুরটা আমাকে দেখেই দাড়িয়ে গেল। মনে হয় আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। আমি লাঠি হাতে কুকুরটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভয় পেল বলে মনে হল না। কুকুরটা আমার পেছন পেছন আসতে লাগল। আমি দ্রুতপায়ে হাটছি। কুকুরটাও আমাকে অনুসরন করছে। আমি দাড়ালে এটিও দাড়িয়ে পড়ছে।

আমার ভয় অনেকটাই কমে এল নদীর ধারে এসে। কারন পাগলা কুকুর কখনো পানিতে নামে না। কিন্তু অবাক ব্যাপার হল কুকুরটা আমার পেছনে পেছনে পানিতে নেমে গেল। আমি যখন নদীটা পার হয়ে নদীর ধারে এসে দাড়ালাম তখন কুকুরটাও নদী পার হয়ে এসেছে। আমার থেকে কয়েক হাত দূরে একটা ঝোপের পাশে দাড়িয়ে প্রচন্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করল। যেন আমাকে কিছু বলতে চাইছে। আমি ঝোপের দিকে অশরিরী একটা কিছু অনুভব করলাম। আমি ঝোপের দিকে একটু এগোতেই কুকুরটা আরো জোড়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল। যেন আমাকে ঐদিকে যেতে নিষেদ করছে।

আমার ভয়টা ততক্ষনে পুরোপুরি কেটে সেখানে এক ধরনের কৌতুহল কাজ কাজ করতে লাগল। আমি ঝোপের কাছাকাছি যেতেই কুকুরটা পেছনে যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে একটু দূরে গিয়ে বসে রইল।

আমি ঝোপের কাছে গিয়ে দেখলাম একটা মেয়ের ডেডবডি পড়ে আছে ঝোপের মধ্যে। মানুষের ভয় একবার পড়ে গেলে সাথে সাথে সে আবার ভয় পেতে পারে না। আমিও ভয় পেলাম না। কার মেয়ে এখানে মরে পড়ে আছে ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল। আমি কিছু না ভেবেই লাশটা কাধে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে হাটতে লাগলাম।

আমি বাড়িতে পৌছেই লাশটা খাটের উপর রাখলাম। তখন হঠাৎ মনে হল ঘরের বাইরে আমার সকল মৃত আত্মীয় স্বজন এসে ভিড় করছে। সবাই আমাকে বাইরে বের হয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছে। আমি কাপা হাতে হারিক্যানটা বের করে ম্যাচ দিয়ে তা জালানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু হাতের কাপুনিটা এতই বেশি ছিল যে হারিক্যানটা জ্বালাতে আমার অনেক্ষন লেগে গেল। হারিক্যান জ্বালানোর পর আমি যা দেখলাম তাতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলাম। মেয়েটি খাটের উপর বসে আসে। আমাকে তার দিকে ডাকছে। আর বাইরে থেকে আমার সব মৃত আত্মীয় স্বজনরা বাইরে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বলছে। আমি আমার মা বাবার গলার আওয়াজ শুনলাম। আমি বের হওয়ার চেষ্টা করেও বের হতে পারছিলাম না। যেন আমার পা মাটিতে গেথে আছে। তারপর দেখলাম মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি প্রাণপনে বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু ততক্ষনে দেরি হয়ে গেছে। মেয়েটি আমার পা কামড়ে ধরল। তখনি দরজায় হুটোপুটির শব্দ শুনলাম যেন দরজা ভেঙ্গে কেউ ভেতরে ঢুকার চেষ্টা বরছে। তার পর মুহূর্তেই কুকুরটা ঘরে ঢুকে মেয়েটিকে কামরে ধরল। আমি তখন বাইরে বেরিয়ে এসেছি। ভেতরে প্রচন্ড ধস্তাধস্তির শব্দ শুনলাম। তারপর কুকুরটি যখন বেরিয়ে এল ভেতরে তখন মেয়েটির ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে আছে। সকালে গ্রামের অনেক মানুষ এসে মেয়েটির ছিন্নভিন্ন লাশও দেখেছে।

অনেকের মুখে যেতে যেতে একসময় এ গল্প পৌছল মিসির আলীর কানে। নেমে পড়লেন রহস্য সমাধানে। চলে গেলেন সেই গ্রামে। মিসির আলী কি পারবেন এই রহস্যের সমাধান করতে নাকি এটা আরও একটা অমিমাংসিত রহস্য হিসেবে স্থান পাবে তার অমিমাংসিত রহস্যের খাতায়? জানতে হলে পড়ে ফেলুন মিসির আলী সিরিজের আরো একটি অসাধারন বই বৃহন্নলা।

ভালো লাগবে আশা করি। হ্যাপি রিডিং।

আর একটা কথা গল্পটা আমার নিজের মত করে লিখা। ভুল হলে ক্ষমাসুন্দর মনোভাব আশা করছি।

৯.চক্ষে আমার তৃষ্ণা

প্রকাশকালঃ ২০০৯
প্রকাশকঃ অনুপম প্রকাশনী
মূল্যঃ ১৪০ টাকা মাত্র।

রিভিউ রাইটারঃ মাসুম আহমেদ আদি

এটা তরুর গল্প। তরুর ভালো নাম শামসুন নাহার। হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য নারী চরিত্রের মতই তরুর চরিত্রও রহস্যময়। তরুর বাবা খালেক সাহেব তরু কে রাগের মুহূর্তে শামসুন নাহার নামে ডাকেন। আজকেও ডাকছেন। আজকে রাগের কারন আছে। তরুও এটা নিয়ে খুব ভয়ে আছে।

তরুর বিচারসভা বসেছে। ঘটনা তেমন মারাত্মক কিছু না। তরুর টেবিলে এক প্যাকেট সিগারেট পাওয়া গেছে। তরুর এক বান্ধবির মামা অস্ট্রেলিয়া থেকে এটা পাঠিয়েছিলেন। ওর বান্ধবি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছিল। প্যাকেটের একেকটা সিগারেট একেক কালারের।

তরুর বাবা যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছেন এই প্যাকেট সে কোথায় পেয়েছেন তখন সে ভয়ে বলেছেন এটা ওসমান চাচা দিয়েছেন। নিকোটিন ছাড়া সিগারেট। তরু জানে ওসমান চাচার কথা বললে বাবা কিছু বলবেনা।এভারও তেমন কিছু বলতে পারেনি।

ওসমান সাহেব তরুদের তিনতলার ছাদে থাকেন।পঙ্গু মানুষ, হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন।মাঝে মধ্যে উনার স্ত্রী উনাকে দেখতে আসেন। সাথে তার ৮ বছরের ছেলে আবির আসে। ওসমান সাহেবের বাড়ি থাকতেও তিনি কেন তরুদের বাসার ছাদে থাকেন এটা তরুর কাছে একটা রহস্য।

তরুর বাবা খালেক সাহেব ব্যবসায়ী মানুষ। নানা রকম ব্যবসা নিয়েই তিনি থাকেন।তার প্রথম স্ত্রী তরুর বড় খালা মারা যাবার পর তিনি তরুর মাকে বিয়ে করেন। তরুর জন্মের একবছর পর তিনিও মারা যান। তরুএ দৃঢ় বিশ্বাস যদি তার আরেকটা খালা থাকতো তিনি তাকেও বিয়ে করতেন। খালেক সাহেব তার দুই স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকীই ঘটা করে পালন করেন।এবং ঐদিন মাওলানা ডেকে তওবা করেন। এটা তিনি কেনো করেন এটাও তরুর কাছে রহস্য।

তরুদের বাসার একতলায় সনজু রা ভাড়া থাকে। সনজু ওর আপা দুলাভাইয়ের সাথে থেকে ভার্সিটি তে পড়ে।সনজুর দুলাভাই খুবই খারাপ প্রকৃতির একজন মানুষ।কারনে অকারনে সনজুকে এবং ওর বোনকে মারধর করেন।তারপরেও সনজু কেনো এখানে পরে আছে এটাও রহস্য।

তরু কিছুদিন থেকে উপন্যাস লিখছে।প্রথমে উত্তমপুরুষে নিজের জীবনের ঘটনা নিয়ে শুরু করেছিল।কিন্তু এখন ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখছে। প্লট হচ্ছে একজন লোক তার দুই স্ত্রী কে খুন করে

বেপারটা দুর্ঘটনা হিসেবে সাজায়।কিন্তু ওই লোকের মেয়ে বড় হয়ে রহস্যের সমাধান করে। প্লট টা অবশ্য ওসমান চাচার কাছ থেকে ধার করা। তিনি এতো থাকতে এরকম একটা প্লট নিয়ে কেনো লিখতে বললেন সেটাও একটা রহস্য।

তরুর কাছে এখন এনেকগুলা রহস্য।তরুর দুচোখ জুড়ে রহস্য সমাধানের তৃষ্ণা।

ব্যক্তিগত মতামতঃ

অনেকদিন পর একটা ভালো বই পড়লাম। তরু চরিত্রটা আমার অনেক ভালো লেগেছে। তাছাড়া আমি বরাবরই রহস্যের পাগল। তরুর চরিত্রটা রহস্যময় বলেই হয়তো আমার ভালো লেগেছে।

১০.কৃষ্ণপক্ষ

রিভিউ রাইটারঃ আশিক সরকার শুভ

এই গল্পটি দুটি হাত নিয়ে। সব রোমান্টিক উপন্যাসে যেমন দুটি হাত থাকে,এই উপন্যাসেও সেরকমটা আছে। একটি হাত মুহিব নামের একটি বেকার ছেলের, আর অন্য হাতটা একজন রিটায়ার্ড পুলিশ কর্মকর্তার মেয়ের যার নাম অরু।মেয়েটির পরিবারটাকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবার বলা চলে।তবে তাদের বাড়িটি দেখে সেটি অনুমান করার কোন উপায় নেই। দুটি হাতই একটি অপরটিকে ধরে বাঁচতে চায়। খুব ভালবাসে তারা একজন আরেকজনকে...

গল্পের শুরুতেই দুটি হাতই এক হয়ে যায়। শুরুতেই দেখানো হয় অরু আর মুহিব পালিয়ে বিয়ে করেছে। তাদের বাসর ঘর সাজানো হয়েছে মুহিবের বন্ধু বজলুর বাসায়। সব বাসর রাতেই প্রত্যেক নরনারীর একটি নতুন জীবন শুরু হয়। একেবারে অচেনা দুজন মানুষ কাবিন নামক একটি কাগজের মাধ্যমে একরকম লিখিত দেয় যে তারা সারাটি জীবন একসাথে থাকবে।একটি ছাদের নিচেই থাকবে।তবে অরু আর মুহিব খুব পরিচিত আর কাছের দুটো মানুষ হলেও তাদের দুজনার বাসর রাতটা সেরকম হলনা। বাসর রাতে অরুর হাতটা ধরে গল্প করার বদলে তাকে আসতে হয়েছে তার দুলাভাইয়ের অফিসে। দুলাভাই তাকে একটি চাকরী দেবেন বলেছেন।দুলাভাইয়ের নির্দেশেই পরেরদিন তাকে চট্টগ্রাম যেতে হবে... মুহিব মনে মনে খুব আনন্দিত হয়।

মুহিব রাতেই ফিরে আসে বজলুর বাসায়।বজলুর বাসায় ফিরে এলে অরু মুহিবকে বাসর রাতে ইন্টারেস্টিং কিছু একটা করার কথা বলে।যেটি তাদের বাসর রাতটিকে স্মরনীয় করে রাখবে।ইন্টারেস্টিং কাজ হিসেবে অরু মুহিবের পাঞ্জাবী পোড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পরে যেন তারা এ গল্পটা সবাইকে বলতে পারে যে দাম্পত্য জীবন তারা শুরু করেছিল পাঞ্জাবী পোড়ানোর মাধ্যমে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হলনা। মুহিব এক রাজ্য ঘুম নিয়ে ঘুমিয়ে গেল। অরু তাকিয়ে আছে মুহিবের ঘুমন্ত চেহারার দিকে। মুহিবকে যেন আরো কাছ থেকে অনুভব করতে পারছে অরু। তাই সে বলেও ওঠে "আমি যে তোমাকে কতটা ভালবাসি তা তুমি কখনও জানবেনা.... "

অরু পরেরদিন বাবার বাড়িতে এসে হাজির হয়। বাড়িতে অরুর বড় বোন মীরুও আছেন।যিনি নিজের বাচ্চার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে অত্যাধিক সচেতন। অরুর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে আরেকটা ছেলের সাথে। তার নামটি এ মূহুর্তে মনে করতে পারছিনা। তবে ছেলে ডাক্তার। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার সময় অরু একটি চিঠি লিখে গিয়েছিল। কিন্তু চিঠিটা কেউ পায়নি। অরু যে বিয়ে করে এসেছে সেটিও কেউ জানতে পারেনি। তবে অরু আরেকটি চিঠি লিখল।এ চিঠিটি ডাক্তার ছেলেটির জন্যে। চিঠিতে মুহিবের কথাও উঠে এসেছে। বেশ বড় একটি চিঠি।

হঠাত করেই মীরুর ছেলে খাওয়া দাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। ছেলে কিছু মুখে নেয়না দেখে অরুর মাকে বলে ওই ডাক্তার ছেলেটাকে খবর দেয়ার জন্যে। সেটি আর হয়নি। মীরু বাবার ঘর থেকে টেলিফোন এনে তার প্রবাসী হাজবেন্ডকে ফোন করে। ছেলের অবস্থা জানানোর জন্যে। তার হাজবেন্ডের সাথে কথা বলার আগেই সে টেলিফোনে পরিচিত এক ফোন কল আসে। ফোনটি বজলুর। অরুকে চাচ্ছিলেন। মীরুকে বললেন যে অরুকে যেন বলে যে মুহিব এক্সিডেন্ট করেছে। এক্সিডেন্ট হয়ে ডাকা চট্টগ্রাম রোডে। মীরু বলে দিল যে জানাবে পরে অরুকে। পরে মীরু তার হাজবেন্ডের সাথে কথা বলল।কথা বলার মাঝে কাঁদলোও। শেষে আর বজলুর ফোন কলের কথা আর মনেই ছিল না তার। ওইদিকে অরু বিছানায় এক কাত হয়ে ঘুমাচ্ছে। ঘুমের মাঝে মুহিবকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখছে। অদ্ভূত স্বপ্ন। মুহিব খালি গায়ে তাদের বাড়িতে এসেছে। অরুকে নেয়ার জন্যে...

এরপর উপন্যাসটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে যখন পাঠক শেষ পর্যায়ে এসে পৌছাবেন ততক্ষনে অরুর জীবন থেকে আরো ২৫ টি বছর কেটে যায়।অরুর বড় মেয়ের বিয়ে আজ। ছোট মেয়ে কান্তার একটি কথা অরুকে হঠাৎ অসুস্থ করে তুললো। "আপা দুলাভাইয়ের পাঞ্জাবী আগুন দিয়ে পুড়াচ্ছে।‘বন ফায়ার হবে’"। অরুর চোখে জল এসে যাচ্ছে তিনি সেই জল সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। নোনা জলটুকু আর থাকতে চাইছেনা কিছুতেই চোখের ভেতর। গাল বেয়ে নেমে যেতে চাইছে...

উপন্যাসটি সম্পর্কে শুধু এটুকুই বলতে পারি, আজকের এই দিনে এসেও এই উপন্যাসের কাহিনী এতটুকু সেকেলে মনে হবে না। একেবারে বাস্তব বলে গণ্য হবে যেকোন পাঠকের কাছে। একটু আশাপাশে চোখ বুলালেই দেখা যাবে হাজারটা অরু আর হাজারটা মুহিবকে। যারা এখনও হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ায়।স্বপ্ন দেখে একসাথে থাকার..

কিন্তু মুহিবের কি হল? কোথায় সে? উপন্যাসের মাঝে এমন কি ঘটেছে যে অরুকে কাঁদতে হবে? সবটা জানার জন্যে পড়তে হবে উপন্যাসটি...

১১.সৌরভ

রিভিউ রাইটারঃ চিলেকোঠার কথক

আচ্ছা,মনে করুন আপনি মুক্তিযুদ্ধের একটি উপন্যাস দেখলেন এবং ভাবলেন সেটি পড়বেন,তাহলে উপন্যাসের ভিতরে কী কী থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?
হয়তো ভাববেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র থাকবে,তাদের অপারেশনের কিছু কিছু বর্ণনা থাকবে,ঢুশঢাশ গুলির আওয়াজ থাকবে,মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের চরিত্রায়ন থাকবে এইতো। আপনি যদি এরকমই ভেবে থাকেন তাহলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি "সৌরভ" পড়ার পরে আপনার ধারণা ৯০% ভুল হবে।এসব ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস লেখা যায়,এবং সেই উপন্যাস মানুষের মনে দাগও কাটতে পারে-তা দেখিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন আহমেদ।

বইটি কী নিয়ে লেখা এই বিষয় সম্পর্কে যদি আগে আপনার ধারনা না থাকে তাহলে বইটি পড়ার মাধ্যমে আপনি টাশকি খেয়ে যেতে পারেন,কারণ বইটির নাম তো কোনমতেই কোন মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার দিকে নির্দেশ করেনা,উপরন্ত বইটির প্রথম দিকে পড়ে এটা যে মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত তাও বোঝা যায়না।

গল্পের নায়ক শফিক নামের এক প্রতিবন্ধি,যার এক পা ছোট।তাকে ঠিক গল্পের নায়ক বলা যায়না,কিন্তু ঘটনা তার মাধ্যমেই প্রবাহিত হয়েছে।সে ঢাকাতে এক বাড়ির মালিক,যে বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকেন বিভিন্ন ধরনের লোক।থাকেন আজাদ সাহেব তার দুই মেয়েকে নিয়ে,বয়স্ক এই লোক প্রায়ই শফিককে নিয়ে বিভিন্ন গল্পগুজব করেন যার বেশিরভাগই অর্থহীন।তার দুই মেয়ে নীলু,বিলু।নীলু হালকা চাপা স্বভাবের মেয়ে,মনে মনে হয়তো শফিককে ভালোবাসে,আর বিলু শফিকের প্রতি তার ভালোবাসা প্রায়ই বিভিন্ন ছলে বুঝিয়ে দেয়।ঘটনাক্রমে উদয় হয় নীলু বিলুর আত্মীয় মতিন সাহেবের,যিনি শফিকের সাথেই থাকা শুরু করেন।
তবে গল্পের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং চরিত্র কাদের,শফিকের কাজের লোক।মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেশিরভাগ উত্তেজনা আমরা তার কাছ থেকেই পাই।সে একবার মিলিটারিদের হাতে বন্দিও হয়।
আরো আছে শফিকের ছিঁচকাদুনে বড়বোন,তার রসিক স্বামী আর তাদের মেয়ে শীলা।
উপরের সবাই একেকজন একেক রকমের লোক,কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ সবাইকে এক করে দিয়েছে।কেউ হয়তো ভাবে পাকিস্তানের সাথে মুক্তিযোদ্ধারা পারবেনা,অপরজন ভাবে মুক্তিযোদ্ধারা সব উড়িয়ে দিল বলে।

কেউ হয়তো গুলির শব্দে ভয়ে কাঁপে,কারও মনে হয়তো তা উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়।
গল্পে আমরা আরো দেখতে পাই প্রিয় মানুষদের কাছে পাওয়ার আকাংখা,পাওয়া যাবেনা সত্ত্বেও আশায় বসে থাকা।
গল্পের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখি শফিক শীলার বান্ধবী নীলাকে তার বাড়িতে নিয়ে আসে তার বাবা মার হাতে তুলে দেয়ার জন্য।কিন্তু নীলার আর বাবা মায়ের কাছে যাওয়া হয়না,আর সবার সামনে কঠিন এই মেয়েটি অন্ধকার রাতে বালিশ ভিজায়,আর স্বপ্ন দেখে স্বাধীন এক বাংলাদেশের।

সব মিলিয়ে প্রায় ৮০ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি অসাধারণ।

১২.মেঘ বলছে যাব যাব

রিভিউ রাইটারঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম রবি

হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে নতুন আর কি বলব। তাই কালক্ষেপন না করে সংক্ষেপে বইটি সম্পর্কে কিছু বলা যাক।

এটি আসলে মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প। যে গল্পে হাসি-কান্না, সুখ -দুঃখ সবই থাকে তবে এগুলো থাকে অনেকটাই ধামাচাপা দেয়া। সমাজে এদের অবস্থান এমন এক স্থানে থাকে যেখানে আমরা তাদের শুধু সুখগুলো দেখি কিন্তু অনুভব করতে পারিনা তাদের দুঃখগুলো। তারা কাউকে কিছু দিতেও পারেনা আবার হাত পেতে কিছু নিতেও পারেনা।

এই গল্পের মুল নায়ক হাসান তেমনই একটি পরিবার থেকে উঠে এসেছে। অনার্স পাস করেও উপযুক্ত লিঙ্কের অভাবে ভাল চাকরি পাচ্ছেনা। ২/৩ টি টিউশনি আর একটি পার্ট টাইম জব (একজন কোটি পতির জীবনী লেখা) এইনিয়ে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। থাকে ভাই ভাবির সাথে। সেইসাথে মা-বাবাও থাকে। তার মনের মানুষটির নাম তিতলি। একসময় অর্থাভাবে+বেকার হওয়াতে হারাতে হয় তিতলিকে। সঙ্গ দোষের কারনে ছোট ভাইটি ও বিপদগামী হয় যার ফলস্রুতিতে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

এতকিছুর পরও নিজের চাকরির জন্য সুপারিশ না করে বন্ধুর চাকরির জন্য বসের কাছে সুপারিশ করে। যারফলে বন্ধুর চাকরি হলেও নিজে বেকারই থেকে যায়।

তার চরিত্রে মুগ্ধ হয় তার বস ও বসের মেয়ে চিত্রলেখা। একসময় ভাবল নিজের চাকরির জন্য বসকে বলবে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বসও মারা যায়। জীবন থেকে সুখপাখিটি তার ডানায় আগুন ধরিয়ে চলে যেতে থাকে। হতাশা, বিষণ্নতাবোধ, একাকীত্ব বোধ প্রভৃতি তার ভেতর বাসা বাধে। কিন্তু প্রকাশ্যে সব কিছু সামলানোর চেষ্টা করলেও নির্জনে ব্যর্থ হয় ঠিক যেভাবে ব্যর্থ হয় মরনব্যধি ব্রেইন টিউমারের কাছে!

ভর্তি হয় হাসপাতালে। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রচুর টাকা যা বহন করা তার ফ্যামিলির পক্ষে অসম্ভব। এমন সময় পাশে এসে দাড়ায় তার কোটিপতি বসের মেয়ে চিত্রলেখা!!! সে নিজেও একজন ডাক্তার। আশ্বাস দেয় বিদেশে গিয়ে উন্নত চিকিত্সা করানোর।

কিন্তু আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ৩০ %

এমতাবস্থায় সে কি বাচবে? ফিরে আসবে তার ফ্যামিলি, চিত্রলেখাসহ সবার মাঝে? জানতে হলে পড়ে ফেলুন হুমায়ূন আহমেদ এর এই উপন্যাসটি।

১৩.নি

ঘরাণা: উপন্যাস
প্রকাশনী: কাকলী প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ:ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার

রিভিউ রাইটারঃ শামসুল আলম

বইটা প্রথমবার পড়েছিলাম প্রায় চার বছর আগে।প্রথমবার বইটা পড়ার পর মনে হয়েছিল এটাই আমার পড়া হুমায়ূন আহমেদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ।অবশ্য পরে মত পাল্টে গেছে।যাইহোক-----
এই উপন্যাসের নায়কের নাম মবিনুর রহমান।তিনি নীলগঞ্জ হাইস্কুলের সাইন্স টিচার।অতি অদ্ভুত টাইপের মানুষ।বয়স ৩৬/৩৭।তিনি বাস করেণ স্কুল থেকে দুই মাইল দুরে একটা জরাজীর্ণ পাকা বাড়িতে।যেকোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে তার ঘরটি।মবিনুর রহমান স্কুল পড়ানো শেষে সন্ধ্যাবেলা টিউশনি করাতে যায় এই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি আফজাল রহমানের মেয়ে রুপাকে।রুপা এসএসসি পরীক্ষা দেবে।রুপা অসম্ভব রুপবতী এবং বুদ্ধিমতী। রুপা মবিনুর রহমানকে পাগলের মত পছন্দ করে।মবিনুর রহমান অবিশ্যি রুপাকে সেই দৃষ্টিতে দেখে না।সে রুপাকে শুধুমাত্র তার ছাত্রীই ভাবে। তারপর ঘটে চলে নানা ঘটনা.... রুপাকি মবিনুর রহমানকে সারাজীবনের জন্য আপন করে পাবে... যদি জানতে চান পড়ে ফেলুন বইটা।

আরেকটা কথা,মবিনুর রহমান মাঝে মাঝে তার স্বপ্নে কিছু বৃদ্ধলোক দেখতে পান।এই বৃদ্ধরা আসলে নি।মবিনুর রহমান নিজেও একজন নি।নিদের রয়েছে অসম্ভব ক্ষমতা।... কি সেই ক্ষমতা যদি জানতে চান এক্ষুনি পড়া শুরু করে দিন।

কেমন লেগেছে--- এখনো পর্যন্ত আমার পড়া অন্যতম সেরা উপন্যাস এটি।সবকিছুই ভালো লেগেছ -বর্ণণা,চরিএগুলো,প্রাকৃতিক দৃশ্যপট, কাহিনী, ,,,,,,,,।সবচেয়ে ভালো লেগেছ রুপা চরিএটিকে।রুপার বড়ভাইয়ের মেয়ে জেবাকেউ ভালো লেগেছ। ও,,,,জেবাও কিন্তু একজন নি।ভালো না লাগার তেমন কিছু খুঁজে পাইনি।তবে হে উপন্যাসটার শেষ থাকলে আরো ভালো লাগত।

রেটিং:৪.৯/৫.০০

বি.দ্র.-- এই বইটাতে একটা ধাঁধাঁ আছে।উত্তরটা বইয়ে দেওয়া নেই আর আমিও উত্তরটা জানিনা।তাই উত্তরটা কেউ জানলে জানাবেন প্লিজ।ধাঁধাটা হচ্ছে --আমবাগানে টুপ করে শব্দ হল।একটা পাকা আম গাছ থেকে পড়ছে।

যে দু'জন শুনল সে দু'জন গেল না
অন্য দু'জন গেল।
যে দু'জন গেল সে দু'জন দেখল না
অন্য দু'জন দেখল।
যে দু'জন দেখল সে দু'জন তুলল না
অন্য দু'জন তুলল।
যে দু'জন তুলল সে দু'জন খেল না

অন্য একজন খেল।।
এখন বলুন ব্যাপারটা কি ?

১৪.কিছুক্ষন

প্রকাশনীঃ আফসার ব্রাদার্স
প্রকাশকালঃ বইমেলা ২০০৭
মূল্যঃ ১১০ টাকা মাত্র।

রিভিউ রাইটারঃ মাসুম আহমেদ আদি

ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। চিত্রা ট্রেন থেকে নেমে যাবে কিনা এটা নিয়ে দুটানার মধ্যে আছে। বড় মামা খবর দিয়েছেন তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর আগে তিনি চিত্রাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে চান। চিত্রা ভালোভাবেই বুঝতে পারছে পুরুষদের চোখে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে বিয়ে হওয়া।

চিত্রার বান্ধবি লিলি তার মামাকে বলে একটা সিঙ্গেল স্লিপিংকারের টিকিট নিয়ে দিয়েছেন। লিলির মামা রেলের বড় অফিসার। লিলি বলেছিল একটা কেবিন চিত্রার একার জন্য ব্যবস্থা করা কোনও বেপারই না।

চিত্রা ওর কেবিনে ঢুকেই দেখল এক লোক লুঙ্গী পরে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছে আর কাশছে। লুঙ্গী হাটুর উপর উঠে আছে। বিশ্রী লোমযুক্ত তার সরু সরু পা দেখা যাচ্ছে। এরকম একটা লোকের সাথে এক কেবিনে যাওয়া অসম্ভব।

এই ট্রেনেই সেলুন কারে করে স্বপরিবারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাচ্ছেন। তার একমাত্র শালির বিয়ে উপলক্ষে ব্যান্ডদল নিয়ে গান বাজনা করতে করতে গ্রামের বাড়ি যাওয়া। হঠাৎ তিনি খবর পেলেন তার মন্ত্রীত্ব চলে গেছে। তারপর তার সাথে ঘটতে থাকল আপত্তিকর ঘটনা।

একটা কেবিন নিয়ে ডাক্তার আশহাব তার মাকে নিয়ে যাচ্ছেন। তার মায়ের কিছুটা মানসিক সমস্যা আছে। তিনি হঠাৎ হঠাৎ অপরিচিত মেয়েকে নিজের বউমা মনে করেন। এই মুহূর্তে তিনি চিত্রাকে বউমা বলে ডাকছেন। ডাক্তার সাহেব চিত্রার দূরবস্থার কথা জানতে পেরে বলেছিলেন চিত্রা তার মায়ের সাথে থাকতে পারে। আর ডাক্তার থাকবে ঐ বুড়োর সাথে। ডাক্তারের মায়ের সাথে থাকতে রাজি হওয়াই চিত্রার জন্য কাল হয়ে দাড়িয়েছে।

ট্রেনে একজন মাওলানাও আছেন। তিনি তার গর্ভবতী স্ত্রী নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। মাঝরাস্তায় স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠলে তিনি মহিলা ডাক্তারের খোঁজ করতে থাকেন। কিন্তু ট্রেনে একটাই মাত্র ডাক্তার এবং সে পুরুষ। মাওলানার মনোভাব এমন যে স্ত্রী যদি মরেও যায় তাও তিনি পুরুষ ডাক্তার দেখাবেন না।

পরে ওই বুড়োর লজিক এবং চিত্রার জেদের কাছে তার হার মানতে হয়।
চিত্রা অবশ্য পরে ঐ লুঙ্গী পরা বুড়োর পরিচয় জানতে পেরেছে। উনার নাম আব্দুর রশিদ। উনি

একজন ম্যাথ জায়ান্ট। পৃথীবির দশজন গণিতবিদের মধ্যে তিনি ৮ নাম্বার। একুশবছর পর তিনি দেশে এসেছেন।

এই ট্রেনে একটি ফুটফুটে বাচ্চার জন্ম হল। একটা প্রণয়ের সূচনা হল। আপনারা নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন কার সাথে কার প্রণয় হয়েছে? ধরতে না পারলে আমার মত আপনিও ঐ ট্রেনে উঠে পড়ুন।

আর হ্যাঁ ভালো কথা। এই ট্রেনে একটা ডেডবডিও যাচ্ছে।

নিজ দায়িত্বে ট্রেনে উঠবেন।

ব্যাক্তিগত মতামতঃ

পুরো গল্পটাই ট্রেনে। একটা চলন্ত ট্রেনে কিছু মজার ঘটনা। আমার ভালো লেগেছে বলেই আপনাদেরও ট্রেনে উঠতে বলছি।

১৫.দেবী

রিভিউ রাইটারঃ আশিক সরকার শুভ

হুমায়ূন আহমেদের অত্যন্ত পাঠকপ্রিয় এবং একইসাথে সমালোচক প্রিয় 'মিসির আলি' সিরিজের প্রথম বই দেবী। যারা মিসির আলির সাথে কম-বেশী পরিচিত তারা সবাই জানেন, মিসির আলি কাজ করেন লজিক বা যুক্তি নিয়ে। কিন্তু 'মিসির আলি' সিরিজের বইয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল, প্রকৃতির রহস্যময়তা যা কোন যুক্তি মানে না। এই বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

বইটির কেন্দ্রীয় চরিত্র রানু। গল্পটি শুরু হয় এক মাঝ রাতের বর্ণনা থেকে। রানু কিছু অস্বাভাবিক অস্তিত্বের উপস্থিতি টের পেতে থাকে, যার বাস এই মর্ত্যে নয়। অন্য কোন ভুবনে। রানুর স্বামী, আনিস, ব্যাপারটি নিয়ে বেশ বিচলিত বোধ করেন। রানুর এই অস্বাভাবিকতাকে অসুস্থতা ধরে নিয়ে আনিস সমস্যা সমাধানের জন্যে মিসির আলির শরণাপন্ন হন। মিসির আলি রানুর প্রচণ্ড ইএসপি ক্ষমতা টের পেয়ে তার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে। এভাবেই গল্পের কাহিনী এগোতে থাকে।

এদিকে রানুদের বাসার বাড়িয়ালার দুই মেয়ে, বিলু আর নীলু। বিলু ছটফটে, বড় বোন নীলু শান্ত। একদিন পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেখে নীলু একটি অপরিচিত মানুষকে ঝোঁকের বশে চিঠি লেখে। একসময় যুবকটির সাথে নীলুর বেশ ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু তখন সরলমতি নীলু বুঝতে পারে নি, এই যুবকটির কারণেই তার জীবনের সবচেয়ে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে।

মিসির আলি রানুর সাথে কথা বলে বেশ অদ্ভুত কিছু তথ্য পান। রানু এগার-বার বছর বয়সে একবার তার চাচাতো বোনের বিয়েতে চাচার বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে নদীতে গোসল করতে নেমে তার এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়। সে অনুভব করে কেউ একজন তাকে টেনে নদীর গভীরে নিয়ে যাচ্ছে। পরে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সবচেয়ে রোমহর্ষক ব্যাপার, তাকে যখন উদ্ধার করা হয় তখন দেখা যায়, তার পা জড়িয়ে আছে এক মৃত মানুষ। তাহলে কি এই ঘটনার কারণেই রানুর ভিতরে একটা ভয় ঢুকে গেছে? যার ফলে তার মনগড়া অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপার সে দেখতে ও শুনতে পায় নাকি অন্য কিছু?

ঘটনার মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে মিসির আলি আর কিছু ঘটনার সন্ধান পান। রানুদের আদি বাড়িতে একটি পুরনো ভাঙা বিষ্ণুমন্দির ও দেবী মূর্তি নিয়ে নতুন রহস্যের সৃষ্টি হয়। নীলুকেও একদিন সেই যুবকটি বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা বলে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কী এক অলৌকিক শক্তির সাহায্যে নীলু ফিরে আসে। কিন্তু এই অলৌকিক শক্তির উৎস কী? রানু আসলে কে? এই সবকিছু জানার জন্যে আপনাকে দেবী বইটি পড়তে হবে।

যদিও বইটি ভৌতিক নয়, তবুও রাতের অন্ধকারে নির্জন ঘরে একা বসে বইটি পড়লে এর রস পুরোপুরি আস্বাদ করা যাবে বলে আমার ধারণা।

১৬.নবনী

প্রকাশকাল, প্রকাশক ও মূল্যঃ জানা নেই ("দশজন" নামে হুমায়ূন আহমেদের একটা সংকলন আছে, আমি সেখানে পড়েছি)

রিভিউ রাইটারঃ মাসুম আহমেদ আদি

দুপুরবেলা মায়ের ডাকে নবনীর ঘুম ভাঙ্গে।ঘুম ভাঙ্গার পর সে জানতে পারে আজ তার বিয়ে। হুট করে কেউ যদি জানে আজ তার বিয়ে তাহলে বিচলিত হওয়ার কথা। কিন্তু নবনী হচ্ছেনা। আসলে তার কোনওরকম অনুভূতিই হচ্ছেনা।

নবনীর ছোটবোন ইরা, ওর মা বাবা সবাই আজকে বেজায় খুশি। নবনীর জীবনে একটা বিরাট ঘটনা আছে যে কারনে নবনীর বিয়ে হচ্ছিলো না। পাত্রপক্ষ দেখতে এসে পাত্রী পছন্দ করে যায় কিন্তু পরে চিঠি মারফত জানিয়ে দেয় তাদের ছেলে এখন বিয়ে করবেনা। এভাবে অনেকগুলা বিয়েই ভেঙ্গে গেছে।

নবনীর বড়মামা খুব গোছানো লোক। এবার তিনি ঢাকার এক পাত্র ঠিক করেছেন। আগে থাকতে কাওকে কিছু জানাননি যাতে লোক জানাজানি না হয়। উনার প্ল্যান ছিল রাতের বেলা এসে বিয়ে পড়িয়ে ভোরে ঢাকার ট্রেনে ওদের তুলে দেয়া।

শেষপর্যন্ত খুব জমকালোভাবেই নবনীর বিয়ে হলো। নবনীর বর নোমান সহজ সরল সাধারন মানুষ।তারপরেও নবনীর তাকে ভালো লাগে। বিয়ের পরদিন তারা ঢাকায় চলে এসে একরুমের একটা ছোট্ট বাসায় নিজেদের সংসার শুরু করে।

এই উপন্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো নবনীর ইতিহাসের টিচার। তিনি ছোটবেলায় এতিমখানায় মানুষ হয়েছেন। মাদ্রাসা লাইনে কলেজ পাশ করে স্কলারশিপ নিয়ে ভারতের আলিগড় ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ করেন। অল্প বয়স বলে নবনীরা তাকে ডাকতো চ্যাংড়া হুযুর। তিনি নবনীদের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

প্রথম জীবনে নবনী এই স্যারের প্রেমে পড়ে। স্যারকে চিঠি পাঠায়। স্যার চেষ্টা করেন এড়িয়ে যেতে।
একদিন সেই স্যার এসে নবনীর বাবাকে বলে যে সে নবনীকে বিয়ে করতে চায়। নবনীকে তার পছন্দ, এবং সেও তাকে পছন্দ করে। একথা শুনে ওর বাবা খুব ক্ষেপে যায়। স্যার এর জিনিশপত্র রাস্তায় ফেলে দেয়। লোকজন জমে যায়। তারা তাকে মারধোর করে। তখন তিনি নবনী নবনী বলে কাতরাচ্ছিলেন। নেত্রকোনা হাসপাতাল থেকে জবাব দিয়ে দিলে ঢাকা নেয়ার পথে সে মারা যায়।

এই ঘটনায় নবনী মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ হয়ে যায়। বড় মামা তখন তাকে ঢাকায় রেখে চিকিৎসা করায়।যতদিন না সে সুস্থ হয় ততদিন পর্যন্ত কাওকে বাসার ঠিকানাও দেন না পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায়

নবনী জানতো এটাই তার জীবনের ভয়াবহ ঘটনা। কিন্তু সে কি ঘূর্নাক্ষরেও জানতো যে তার জীবনে এর চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ছিল?
উপন্যাসের শেষের দিকে এসে নবনী সেটা জানতে পারে।

ব্যাক্তিগত মতামতঃ

অনেকদিন পর হুমায়ূন আহমেদের প্রেমের উপন্যাস পড়লাম। মনটা ভালো হয়ে গেল। নবনীর প্রথম প্রেম বেচারা স্যার এর জন্য মন খারাপ হয়েছিল যদিও। একটা জিনিশ শিখেও নিলাম।

হুট করে যদি রাস্তাঘাটে বউকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তাহলে বলবঃ

- এই তোমার জ্বর নাকি?চোখ লাল কেন? বলেই কপালে হাত দিয়ে ছুঁব।

১৭.মধ্যাহ্ন

প্রকাশনীঃ অন্য প্রকাশ
প্রকাশকালঃ মধ্যাহ্ন ১ম খন্ড ২০০৭
মধ্যাহ্ন ২য় খন্ড ২০০৮
মূল্যঃ ধারের বই জানিনা (গায়ের মূল্য দুটি খন্ড একত্রে ৬০০ টাকা)
পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ২৩৮+২৪০
ধরনঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস
রিভিউ রাইটারঃ সুজন শহীদুল

লেখক কথাঃ
"বইটি ১৯০৫ সনে কাহিনী দিয়ে শুরু করতে চেষ্টা করেছি। পাঠকরা চমকে উঠবেন না। আমি ইতিহাসের বই লিখছি না। গল্পকার হিসেবেই গল্প লিখছি।

কৃতজ্ঞতাঃ
বইটি রবি ভাই দিয়েছেন পড়ার জন্য। অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাই আপনাকে। আশা করি বারবার ধন্যবাদ পাওয়ার জন্য ভবিষ্যৎ এ আরো বই দিবেন।tongue emoticon

রিভিউঃ
কাহিনীর সূত্রপাত ১৯০৫ সন থেকে। বান্ধবপুর গ্রাম পুরোপুরি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। দুয়েক ঘর মুসলমানও আছে বটে। গল্প শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মাঝে হরিচরণ সমাজচ্যুত হয় পুজার ঘরে মুসলমানের সন্তানকে কোলে নিয়ে পূজা অর্চনার ধরুণ। সমাজচ্যুত করেন তৎকালীন রাজা শশাংক পাল। সমাজচ্যুত হওয়ার ফলে নিঃসঙ্গ হয়ে যায় হরিচরণ। এমতাবস্থায় সহযোগিতা করতে আসে মুসলমান ছেলেটির মা জুলেখা। পরবর্তিতে শশাংক পালের রাজত্ব নিলামে উঠলে তাহা কিনে নেন হরিচরণ। হরিচরণ হয়ে উঠে সমাজের প্রভাবশালী লোক। নানানজন বিপদে আশ্রয়প্রার্থী হয় তাহার নিকট। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম কিরন গোস্বামী, শশী নামে ছদ্মবেশে আশ্রয়পার্থী হন তাহার নিকট। শুধু আশ্রয় দেয় না হরিণচরণ, একটা স্কুল নির্মাণ করে দেন তাকে। শশী হয়ে উঠে শশী মাষ্টার। একে একে হরিচরণ অনেককে সহযোগিতা করেন। ধনু শেখ, জহির প্রমুখকে। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলস্বরুপ হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধতে শুরু করে। বিভিন্নরকম প্রচেষ্টা চালানো হয় দাঙ্গা রুখতে।(যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখী বন্ধন কার্যক্রম) তবুও কাজ হয় না। একে একে ঘটতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ আন্দোলন সহ যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। যাহা বইটি পাঠ পূর্বক বিশদ জানতে পারবেন।

পাঠ প্রতিক্রিয়াঃ
হুমায়ুন স্যারের বই নিয়ে আমার যথেষ্ট আফসোস আছে। তাহার বই শুরু করার আগেই শেষ হয়ে যায়। সেই দুঃখটা এ বইটা কিছুটা হলেও লাঘব করেছে। বইটির ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সহজভাবে বর্ণণা করার ফলে সুখপাঠ্য কাঁতারে রাখবো এ বইটি। পড়েন দেখেন নিরাশ হবেন না

১৮.অপেক্ষা

প্রকাশকালঃ১৯৯৭
অষ্টাদশ মুদ্রণঃ ২০১২
মূল্যঃ ৩০০ টাকা মাত্র।

রিভিউ রাইটারঃ মাসুম আহমেদ আদি

ইমনের বয়স যখন ৫ বছর তিন মাস সেদিন ইমনের দাঁত পরে।দিনটা ওদের জন্য স্মরণীয়। একই দিনে ইমনের ছোটচাচা এম.এ পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।ইমনের মা সুরাইয়া বেগম ইমনের বাবাকে ফোন করে ইমনের দাঁত পরার কথা বলেন।ইমনের ছোটচাচা ফিরোজের এম.এ পরীক্ষা না দেয়ার কথা বলেন।আরেকটা অনেক বড় খবর বলার ছিল।তার ভিতরে আরেকজন মানুষের অস্তিত্ব তিনি অনুভব করছেন।সেটা ইমনের বাবাকে সামনাসামনি বলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ইমনের বাবা সেরাতে আর ফিরে আসেনি। তারপর থেকেই ইমনের মা সুরাইয়া বেগমের অপেক্ষা শুরু হয় তার স্বামীর জন্য। কিছুদিন পরেই ইমনের বোন হয়। ইমনের মা ওকে অপয়া মনে করে। অনাদরে বেড়ে উঠতে থাকে ওরা।

নিজেদের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে সুরাইয়া বেগম ইমন এবং ওর বোন সুপ্রভাকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ি চলে যায়।ওখানে মামাতো দুই যমজ ভাই শোভন টোকন ও মামাতো বোন মিতুর সাথে ওরা বড় হতে থাকে।

ইমন এখন ভার্সিটি তে পড়ে। সুপ্রভা ৭ম শ্রেণীতে। ইমনের মা এখনও তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেন।তার বিশ্বাস ইমনের বিয়ের রাতে তার বাবা ফিরে আসবে।

নিজস্ব মতামতঃ

মিতুর দুষ্টামিগুলা খুব মজার ছিল। আবার শোভনের বেয়াড়াপনাও আনন্দদায়ক। সব থেকে ভালো লেগেছে ছোটচাচাকে।আমার খালি বার বার মনে হচ্ছিল আমার যদি এমন একটা ছোটচাচা থাকত। যে সকল বিপদে আমাকে সাহস যোগাবে। কোনও কঠিন বিপদের সময় আমাকে বলবে " কিরে বেটা হার্ড নাট এতো অল্পতেই ভেঙ্গে পড়লে চলে?" ছোটচাচা একবার দেশের বাইরে থেকে ইমনকে চিঠি পাঠায়। সাথে ২০০ ডলার। চিঠিটা পড়ার সময় আমার চোখও আর্দ্র হয়েছিল।আপনাদেরও হবে।আরও কিছু কিছু যায়গায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১৯.নীল অপরাজিতা

বিভাগঃ উপন্যাস

রিভিউ রাইটারঃ আরমান ভাই

নীল অপরাজিতা উপন্যাসটি ঘুরপাক বা আবর্তন করেছে একজন লেখক কে ঘিরে যার নাম শওকত। এই লেখকের জীবনের ছোট একটা অধ্যায় উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে খুব সুচারুরুপে। লেখকের জীবনের প্রাপ্তি,অপ্রাপ্তি,মায়া,মোহ সবই আছে উপন্যাসের বিভিন্ন লাইনে লাইনে। মূল গল্পের সারাংস এখন বলতেই হচ্ছে।

শওকত সাহেব তার লেখা শেষ করার জন্য অবস্থান পরিবর্তন করেন,কারন পরিবেশ পার্থক্যে লেখকদের লেখনী কখনো কখনো অন্যরকম মাত্রা নিয়ে আসে সেই বিষয়টা পরীক্ষা করা,এছাড়াও লেখক শওকত সাহেব তার চলমান জীবন থেকে কিছুটা ব্রেক চেয়েছিলেন। আসলে জীবন চলার পথে সংসার ধর্ম করতে করতে অধিকাংশ পুরুষই বোধহয় একটা সময় হাপিয়ে উঠে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে আশেপাশের পরিবেশ যেমন বদলায় তেমনি চেনা মানুষের স্থানে অপরিচিত মুখ চলে আসে। সেই প্রবাহমানতায় গল্পের নায়িকা পুস্পের আগমন। দারুন সুন্দর নাম “পুস্প”। পুস্পের নাম যেমন সুন্দর তেমনি তাহার রুপ। পুরুষরা বোধকরি মেয়েদের রুপই আগে দেখে,আর লেখকরা আরো বেশি দেখেন। লেখক শওকত সাহেব তার চেতন বা অবচেতন মনে সেই রুপের প্রেমে পড়ে যান। আসলে শব্দটা প্রেম হবে না হবে মোহমায়া, তিনি পুস্পের মোহমায়ায় পড়ে যান। অসাধারণ সেই মুগ্ধতা। কিন্তু প্রকাশের অবকাশ ছিল না।অপর দিকে গল্পে শওকত সাহেবের স্ত্রীর প্রতিও অনেক স্থানে তারপ্রতি কিছুটা অভিমান প্রকাশ পেলেও ভালবাসাকে তা ছাপিয়ে যেতে পারে নি।কিন্তু জীবনে অনেক কিছু চাইলেও বাস্তবতা,সামাজিকতা,নিজের বিবেকবোধ এর কারনে মানুষ তা বলতে পারে না বা তাকে উপেক্ষা করে চলতে হয়। পুস্পের প্রতি লেখকের এই দূর্বলতা এবং তার নিজের ভেতরের অন্তর্দন্দ্ব দিয়েই শেষ হয়েছে গল্পের উপ্যাখ্যান। হুমায়ুন আহমেদ নিজে গল্পটি শেষ না করে পাঠকের মনের ভাবনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন শেষ অংশে এসে যার কারনে পাঠকের দায় বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই।

উপন্যাসটি সুখ পাঠ্য এবং পড়ার পর বর্ষা ঋতুকে নতুন করে ভাবনায় এনে দেবে যে কাউকে। আমরা সচরাচর প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষন করিনা উপেক্ষা করে যাই,কিন্তু এই উপন্যাস পাঠের মধ্যদিয়ে সচেতন পাঠকের মাঝে নতুন করে বর্ষাকে দেখার সাধ হবে বলে আমার ধারনা। গল্পে নারী মন কেমন এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের ব্যাবহার কেমন হয় তার সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যাবে।এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, শওকত সাহেবের লেখালেখি করার জন্য স্থান পরিবর্তন তার স্ত্রী পছন্দ করেন না তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তার স্ত্রী তার ব্যাগ গোছানোর সময় অপ্রয়োজনীয় একটা বই দিয়ে দেয়। হয়তো এটাই ছিল শওকত সাহেবের স্ত্রীর নীরব প্রতিবাদ।

লেখনীর এই পর্যায়ে সামান্য সমালোচনা করতে চাচ্ছি। আমার কাছে উপন্যাস হিসাবে এর চরিত্রের সংখ্যাগুলি সল্প মনে হয়েছে। পুষ্পের চরিত্র আরো বিকশিত হবার সুযোগ ছিল বলে মনে হয়েছে। আর এ কথা না বলে থাকতে পারছি না যে, বইটির প্রচ্ছদ মোটেও গল্পের সাথে যায় নি। প্রচ্ছদে আরো ভাল কিছু আশা করেছিলাম একজন পাঠক হিসাবে। আমার কাছে মনে হয়েছে প্রচ্ছদটা উপন্যাসের আগে করা হয়েছে বা তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে।

২০.রং পেন্সিল

রিভিউ রাইটারঃ তুহিন খান

আমার বই পড়ার ধরনটা বিচিত্র না হলেও খুব একটা স্বাভাবিকও নয়।একটি বই পড়া শুরু করি।তার মাঝেই আরো অনেকগুলি।শেষপর্যন্ত কোনটা কবে শেষহয় সিরিয়াল ঠিক থাকে না।

হুমায়ূন আহমেদের আত্মজৈবনিক বই "রঙপেন্সিল"আজ শেষ করলাম।রঙপেন্সিলের রচনাগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।যথাঃ

১।বিজ্ঞান ও ধর্ম

২।অশরীরী জীব ,আত্মা এসম্পর্কীত কথাবার্তা

৩।নববর্ষ এবং উৎসব

৪।রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য মনীষীকে নিয়ে আলোচনা

৫।বিবিধ।(তার ব্যক্তিগত স্মৃতি,ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ,খণ্ডিত কোন বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদি)!

ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে এর আগের বইগুলিতে (বলপয়েন্ট,ফাউন্টেনপেন,কাঠপেন্সিল) তেমন আলোচনা করেন নি।এই বইটির প্রায় আট দশটি রচনায় ধর্ম ও বিজ্ঞান এসেছে।জীবনের শেষদিকে এসে লেখকদের নানাধরনের দার্শনিক জিজ্ঞাসা এসে ঘিরে ধরে।হয়ত তারই ফসল এই লেখাগুলি।

বিজ্ঞান ও ধর্মসম্পর্কীত তার রচনাগুলি ধোঁয়াটে।প্রায় প্রতিটি লেখায়ই তিনি ঈশ্বর বা আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমান দিয়ে আবার এমন কথাবার্তা বলেছেন যা এর বিপরীত।"প্রসঙ্গঃআত্মা"নামক প্রবন্ধে তিনি জনৈক আস্তিক বিজ্ঞানীর মৃতর ওজন পরিমাপ করে আত্মার উপস্থিতি বিষয়ক পরীক্ষা এবং এর অসারতা উল্লেখ করে শেষে বললেন,

বিজ্ঞানে ভুয়া অংশ আছে।একদল মানুষের চেষ্টাই থাকে ধর্মমত প্রচারে ভুয়া বিজ্ঞান হাজির করা।

আমার মতে ধর্ম থাকবে ধর্মের মত,বিজ্ঞান বিজ্ঞানের মত।তেল জলকে ঝাঁকিয়ে এক করার প্রয়োজন নেই।এমন একদিন হয়তোবা আসবে যেদিন থিওসফি ও ফিজিক্স এক হয়ে যাবে।

কথাগুলো আমার কাছে ধোঁয়াটে লেগেছে।মানলাম ধর্ম আর বিজ্ঞানকে আলাদা রাখা ভালো।কিন্তু যেখানে বিরোধ?যেখানে বিজ্ঞান বলছে আত্মা নেই,পরকাল নেই,ঈশ্বর নেই আর ধর্মের ভিত্তিই এগুলোর ওপর সেখানে আপনি কি করবেন?দুয়োটাই বিশ্বাস করবেন?সেখানে তো যুক্তিপ্রমান দিয়ে একটিকে ভুল প্রমান করতেই হবে তাইনা?অথচ তিনি একদিকে বলছেন বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মপ্রমান ভুয়া,আবার বলছেন থিওসফি ও ফিজিক্স মিলে যাবে।হাউ সেলুকাস!

"মহেশের মহাযাত্রা"নামক প্রবন্ধে আবার তিনি নিজেই বিজ্ঞান দিয়ে ঈশ্বর প্রমানের চেষ্টা করেছেন।ষ্টিফেন হকিং য়ের নাস্তিকতার বিপরীতে তিনি বেশ জোরালো যুক্তিতে ঈশ্বর প্রমানের চেষ্টা

করেছেন।এই চেষ্টা তিনি করেছেন "কাঠপেন্সিল" এর "শ্রোডিনজারের বিড়াল"নামক প্রবন্ধেও।তবে এই প্রবন্ধের শেষদিকে এসে তিনি আবারো ধোঁয়াটেপনা করলেনঃ

নাস্তিক আস্তিক দুই দলই জেগে ঘুমিয়ে থাকার ভান করেন বলে তাদের ঘুম ভাঙানো যায় না।বিপদে পড়েন সন্দেহবাদীরা।যত দিন যায় ততই তাদের সন্দেহ বাড়তে থাকে।বাড়তেই থাকে।

হুমায়ূন আহমেদের ঈশ্বরবিষয়ক প্রবন্ধগুলি পড়ে আমার তাকে একেক সময় একেকটা মনেহয়েছে।সম্ভবত তিনি অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন।এটা একান্তই ব্যক্তিগত মতামত।

অশরীরী আত্মা বা অতিলৌকিক ঘটনা বা জ্বীনে তিনি কি বিশ্বাস করতেন?এ ব্যাপারেও যথেষ্ট হেঁয়ালী করেছেন তিনি।অতিলৌকিক অনেক ঘটনা তিনি নিজের জীবন থেকে উল্লেখ করেছেন এমনভাবে,যাতে তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিরুপন কঠিন।নুহাশ পল্লীর জ্বীনবিষয়ক অনেক ঘটনা তিনি বলেছেন।এই বইয়ের "জ্বীনের বাদশাহ"রচনাটিতেও।কিন্তু পাঠক শেষপর্যন্ত তার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ।

রবীঠাকুর এবং আইনষ্টাইনকে নিয়ে তার আগ্রহ উন্মাদনা ব্যাপক।এই বইটিতে রবীঠাকুর সম্পর্কে অনেক বিচিত্র তথ্য দেয়া হয়েছে।হাসন রাজাকে নিয়ে তার আগ্রহের সূচনা ও তৎপরবর্তী ঘটনা বর্নিত হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদের জ্ঞানের আগ্রহ একটি শিক্ষনীয় ব্যাপার।গাঁজা গাছ,জ্বীন আরো বিভিন্ন বিষয় যখনই সামনে এসেছে তিনি এগুলো নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেছেন।আমাদের জন্যে নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

হুমায়ূন আহমেদের আত্মজীবনীর অনেক ঘটনা আমার কাছে অতিকথন মনেহয়েছে।হুমায়ূন আহমেদ সারাজীবন রহস্য করে গেছেন।সম্ভবত তিনি এই ডিলিউশনে ভুগতেন যে তিনি খুব রহস্যময়।তার এমনই থাকা উচিত।তাই আত্মজীবনীর অনেক ঘটনাকে আমার কার্যকারণহীন অতিকথন বলে মনেহয়েছে।সেসব আর উল্লেখ করছি না।আল্লাহই ভালো জানেন।তবে হুমায়ূন আহমেদের আত্মজৈবনিক বই বিপুল আনন্দ ও করুণাধারার উৎস একথা সন্দেহাতীত।

বইপোকাদের আড্ডাখানা

এ্যাডমিন প্যানেলের সদস্যবৃন্দ:

♦ ওয়াহিদ অনঘ (প্রতিষ্ঠাতা)

সামিউস সামি, আর্য্য মিঠুন, আশিক সরকার শুভ, মাসুম আহমেদ আদি,শাহনাজ রহমান, তুহিন খান, সাবাতুন জান্নাত তিয়ানা, ফারিয়া মেহরিন, নিশাত নিলীমা, দুষ্ট ইমন, রফিকুল ইসলাম রবি,মুমিতুল মিম্ম্এসএম অয়ন,মাশুক খান, হিমেল আরিফ, সুজন শহিদুল,শিবলি আহমেদ,মুনঈম সুলতানা সাথী, সাদমান হাসান,জন রাসেল টস,হার বেনি, হানান মাক্কিয়া স্নেহা এবংমার্জিয়া হাসান জিনিয়া